মূলপাতা

পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি! পর্ব-২

Asif Adnan

November 2, 2017

36 MIN READ

ব্রুস

রাইমাররা বিয়ে করেছিল অল্প বয়সে। প্রেগনেন্সির ব্যাপারে যখন জানতে পারলো, তখনো ওদের বিয়ে হয়নি। জ্যানেটের বয়স ছিল ১৯, রনাল্ডের ২০। জ্যানেটের সবসময় শখ ছিল যমজ ছেলের যমজ দুই ভাই ব্রুস আর ব্রায়ানের জন্ম ছিল তাই স্বপ্ন সত্য হবার মতো। খুব তাড়াতাড়ি রনাল্ডের দুটো প্রমোশন হল। ছোট্ট এক রুমের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ওরা মোটামুটি বড়সড় একটা ঘরে আসলো। রাইমারদের জীবন সুন্দর ছিল। গৃহিণী মা, পরিশ্রমী বাবা। আর ঘর আলো করে রাখা যমজ দু'ই ভাই। পিকচার পারফেক্ট।

ছন্দপতন হল ছ'মাসের মাথায়। ডায়াপার বদলানোর সময় ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ে। জ্যানেট ভেবেছিল ভেজা ডায়াপারের কারণেই হয়তো ওরা কাঁদতো। কিন্তু দেখা গেল ডায়াপার ছাড়া রাখলেও কান্না থামছে না। প্রস্রাবের সময় সমস্যা হচ্ছে। ডাক্তার জানালেন ওরা দুজনেই ফিমোসিসে ভুগছে। ফিমোসিস গুরুতর কোন সমস্যা না। মোটামুটি কমন। ছেলে বাচ্চারা ফিমোসিসের কারণে ঠিক মতো প্রস্রাব করতে পারে না। খুব বেশি চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ, ক্ষেত্রে ফিমোসিস আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যায় তবে সেইফ সাইডে থাকার জন্য সারকামসিশান, অর্থাৎ খৎনা করানোর পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। যমজ দু ভাইয়ের ৭ মাস বয়সে তাদের সারকামসিশানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

সারকামসিশান বা খৎনা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা খুব সহজ একটি প্রক্রিয়া। ৯৯% চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে এতে বড় ধরণের কোন ঝামেলা দেখা যায় না। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে বাঁশের চিমটা, ক্ষুর আর কাঁচি দিয়েই খোলা আকাশের নিচে পিড়িতে বসিয়ে সুন্নাতে খৎনা করা হয়। কয়েক মিনিটের মামলা। পশ্চিমা বিশ্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। তবে এয়ার কন্ডিশনড হসপিটালের অপারেশান থিয়েটারে, স্টেরিয়ালাইযড ক্ল্যাম্প আর স্ক্যালপেল দিয়ে। ব্রুস আর ব্রায়ানের ক্ষেত্রেও যদি এমনটা হত তাহলে হয়তো আমাদের এ গল্প অন্য কোন ভাবে শুরু করতে হতো। কিন্তু ব্রুস আর ব্রায়ানের অপারেশনের দায়িত্বে থাকা ৪৬ বছর বয়েসী জেনারেল প্র্যাক্টিশানার ডাঃ য'ন মারি স্ক্যালপ্যালের বদলে সেই দিন বোভি কটারি মেশিন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। এ ডিভাইসে একটি ছোট জেনারেটরের মাধ্যমে একটি সূচের মতো ইলেক্ট্রোডের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। বিদ্যুতের প্রবাহের কারণে ইলেক্ট্রোডে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার সাহায্যে "কাটা" হয়। একটা ছুরি বা স্ক্যালপেলের সাথে এ ডিভাইসের পার্থক্য হল, এক্ষেত্রে মূলত পোড়ানোর মাধ্যমে "কাঁটা" হয়। এ পদ্ধতির সুবিধা হল তাপের কারণে সৃষ্ট হওয়া ক্ষতের প্রান্তগুলো পুড়ে যেতে থাকে। যার ফলে রক্তনালীগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্লিডিং তুলনামূলক ভাবে কম হয়। পদ্ধতিটিকে ইলেক্ট্রো-কটারাইযেশান (electrocautery) বলা হয়। মূলত আঁচিল জাতীয় গ্রোথ ফেলে দেয়ার জন্য ইলেক্ট্রোকটারাইযেশান বেশ কার্যকরী মনে করা হয়। কিন্তু সারকামসিশান বা খৎনার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোকটারাইযেশান ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপদজনক।

১৯৬৬ –র এপ্রিলের ঐ সকালে ডাঃ যন মারির হাতের ডিভাইসটি বেশ কয়েকবার ম্যালফাঙ্কশান করে। প্রাথমিকভাবে ইলেক্ট্রো-কটারি মেশিনের হেমোস্ট্যাট ডায়াল 'মিনিমামে' সেট করা হয়। কিন্তু প্রথমবার ডাঃ যন মারি চামড়া বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হন। হেমোস্ট্যাট ডায়াল বেশ অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় বার ব্রুসের যৌনাঙ্গের চামড়ার সাথে ইলেক্ট্রোড স্পর্শ করানোর সাথে সাথে রুমের সবাই মাংস পোড়ার শব্দ ও গন্ধ পেলো। ডাক্তাররা বুঝতে পারলেন খুব বড় ধরণের একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হসপিটালের বেডে ঘুমন্ত ব্রুসের দু'পায়ের মাঝখানে জ্যানেট আর রনাল্ড পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া সুতোর মতো কিছু একটা দেখতে পেল। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে ব্রুসের সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়া লিঙ্গ ধীরে ক্ষয় হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ডাক্তাররা ব্রায়ানের উপর সার্জারি না করার সিদ্ধান্ত নেন। অন্য আরো অনেকের মতোই ব্রায়ানের ফিমোসিসের সমস্যা আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু ব্রুসের অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেল। ১৯৬৬ তে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। রি-কনস্ট্রাকটিভ সার্জারির মাধ্যমে ভুল শুধরে নেয়ারও কোন উপায় ছিলো না।

কীভাবে কী হয়ে গেল, জ্যানেট আর রনাল্ড বুঝতে পারছিলো না। যেন মুহূর্তের মাঝে এক ঝড় এসে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেললো। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে বসলে অনেকে সময় জ্যানেটের কাছে অবাস্তব মনে হতো। ব্রুস আর কোনদিনই আর দশটা ছেলের মতো হতে পারবে না, এ চিন্তাটা ভেতরে থেকে ওদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। ওরা নিজেদের দোষী ভাবছিল।

* * *

ডঃ জন মানিকে রাইমাররা প্রথম দেখে টিভি পর্দায়। দুর্ঘটনার প্রায় দশ মাস পর। মধ্য ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায়। This Hour Has Seven Days নামের ক্যানেইডিয়ান ব্রডক্যাস্টিং কর্পোরেশানের জনপ্রিয় টক শো-তে। কালো মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনের শান্ত চোখ দুটোতে বুদ্ধির ছাপ। ডানদিকে সিঁথি করা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। নীরবতা এবং কথা বলার সময় নিয়ন্ত্রিত আত্মবিশ্বাস ভেতর থেকে ঠিকরে বের হয়। বুদ্ধিমান, ক্যারিযম্যাটিক। মানুষটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলেন। দেখে মনে হয় তার উপর আস্থা রাখা যায়।সাইকলোজিস্ট, পিএইচডি, হার্ভার্ড জ্যানেট আর রনাল্ড রাইমার মনে মনে এমন একজন মানুষকেই খুঁজছিলো। অতিথি হয়ে আসা জন মানি বাল্টিমোরে খোলা জনস হপকিন্স হসপিটালের নতুন একটি ক্লিনিক নিয়ে কথা বলছিলেন। মানির উদ্যোগে খোলা এ ক্লিনিকের উদ্দেশ্য ছিল সার্জারির মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হিজড়া বা Hermaphrodite/Intersex নারী ও পুরুষদের লিঙ্গ পরিবর্তন করা। এটা ছিল অ্যামেরিকাতে এধরনের প্রথম ক্লিনিক। মানির গবেষণা ছিল মূলত এ বিষয় নিয়েই। রাইমাররা টিভির পর্দায় ডঃ-কে বলতে শুনলেন – "আমাদের কাছে গুরুতর মনে হলেও যেসব মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছেন, একটা সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে আছে, তাদের জন্য এধরনের সার্জারি সারকামসিশানের চেয়ে এমন আলাদা কিছু না।"

নিঃসন্দেহে ডঃ মানির সাক্ষাৎকার অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ছিল, তবে রাইমারদের জন্য হয়তো পুরো ব্যাপারটা বিচ্ছিন্নভাবে কৌতূহলজনক একটা স্মৃতি হিসেবেই থাকতো। কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষ দিকে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন দর্শক ডঃ মানিকে এমন একটি প্রশ্ন করে যা রাইমারদের মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। প্রশ্নটি ছিল অসম্পূর্ণ যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের সম্ভাব্য চিকিৎসার ব্যাপারে। জবাবে মানি বলেন, জনস হপকিন্স ক্লিনিকে সার্জারি এবং হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এধরনের শিশুদের নারী বা পুরুষে পরিণত করা সম্ভব। ডঃ মানি বলছিলেন – কোন শিশু নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্ম নিলো কি না, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। শৈশবে শিশুদের লিঙ্গ পরিবর্তন করা সম্ভব। কোন ঝামেলা ছাড়াই ছেলে শিশুকে মেয়ে আর মেয়ে শিশুকে ছেলে হিসেবে বড় করা সম্ভব। রাইমাররা ঠিক করলো ওরা ভুল শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র জ্যানেট ডঃ মানিকে চিঠি লিখতে বসলো। কয়েক মাসের মধ্যে ওরা বাল্টিমোরে জন মানির অফিসে হাজির হল।

ব্রেন্ডা

ব্রুসের কেইস হিস্ট্রি শোনার পর, ওর ফিযিকাল চেকআপের পর জন মানি পরামর্শ দিলেন ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করার । প্রথমে castration এর মাধ্যমে ব্রুসের শরীর থেকে পুরুষ যৌনাঙ্গের অবশিষ্ট অংশ বাদ দেয়া হবে। কৈশোরের শুরুতে হরমোন ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। আর ট্রিটমেন্টের শেষ পর্যায়ে সার্জারি মাধ্যমে ওর শরীরে কৃত্রিম যোনি স্থাপন করা হবে। ও কখনো মা-হতে পারবে না, কিন্তু একজন সাধারণ নারীর মতো যৌন জীবন যাপন করতে পারবে। একজন অসম্পূর্ণ পুরুষের বদলে ও একজন পরিপূর্ণ নারী হতে পারবে। ডঃ মানি রাইমারদের অভয় দিলেন, প্রথম শোনায় যতোটা গুরুতর মনে হয় আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছুই না। একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী এটা পাথরে লেখা কিছু না। জন্মসূত্রে একজন মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মায় না। বরং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে একজন মানুষ 'পুরুষ' অথবা 'নারী' হিসেবে বেড়ে ওঠেন। প্রকৃতি না, পরিবেশ একজন মানুষকে 'পুরুষ' অথবা 'নারী' বানায়। সুতরাং কেউ কোন ধরণের শরীর নিয়ে জন্মাচ্ছেন তার চাইতে মানসিকভাবে

কোন লৈঙ্গিক পরিচয় (Gender Identity/Gender Role) সে গ্রহণ করছে, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের প্রথম দুই বছর একজন মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয় ফ্লুয়িড বা পরিবর্তনশীল থাকে। এসময়ের মধ্যে একজন মানুষকে ঠিক কীভাবে বড় করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে সে নিজেকে নারী হিসেবে চিনবে নাকি পুরুষ হিসেবে। একই কথা খাটে যৌনতার ক্ষেত্রে। কে নারীর প্রতি আর কে পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এটা পারিপার্শ্বিকতা আর পরিবেশ ঠিক করে দেয়। প্রকৃতি না। তাই ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। শুধু এটুকুনিশ্চিত করতে হবে, ব্রুস যেন সবসময় নিজেকে একজন মেয়ে হিসেবে চেনে।

ডঃ মানির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তীব্র আত্মবিশ্বাস আর ক্যারিযমার প্রভাব তো ছিলই, সাথে আরো ছিল জনস হপকিন্স আর স্টেইট অফ দি আর্ট ট্রিটমেন্টের নিশ্চয়তা। বিশ্ববিখ্যাত গবেষক ব্যক্তিগতভাবে ব্রুসের কেইস হ্যান্ডেল করছেন, ব্রুস সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসার নিশ্চয়তা পাচ্ছে। মানির কথা না শোনার কোন কারণ উইনিপেগের ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে আসা রনাল্ড আর জ্যানেটের ছিল না। রাইমার দম্পতি যে ব্যাপারটা জানতো না তা হল, যা কিছু জন মানি তাদের বলেছিল তার পুরোটুকুই ছিল অনুমান। অপ্রমাণিত। ডঃ মানি হিজড়াদের উপর করা কিছু অপারেশানের ভিত্তিতে এই উপসংহার টানছিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম নেওয়া একজন ছেলে শিশুকে কোন জটিলতা ছাড়াই মেয়ে হিসেবে বড় করা সম্ভব। এ উপসংহারের মূল ভিত্তি ছিল তার এই বিশ্বাস যে লৈঙ্গিক পরিচয় ও যৌনতা দুটোই পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট নির্ভর। প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয় কোন বিষয় না। এটা কেবল হিজড়াদের জন্য না, বরং সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দীর্ঘদিন ধরে এ মত প্রচার করলেও বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণের কোন সুযোগ মানি পাচ্ছিলেন না। কারণ কোন বাবা-মাই সুস্থ-স্বাভাবিক সন্তানের ওপর এধরনের পরীক্ষা করার অনুমতি দেবে না। ব্রুস ছিল তাই জন মানির হাইপোথিসিস প্রমাণের পারফেক্ট টেস্ট সাবজেক্ট। দু বছরের কম বয়স। স্বাভাবিক ছেলে সন্তান, দুর্ঘটনার কারণে যার যৌনাঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে। এবং ব্রুসের ছিল একজন আইডেন্টিকাল টুইন। অর্থাৎ বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে টেস্ট সাবজেক্ট ব্রুসকে, স্বাভাবিক ব্রায়ানের সাথে তুলনা করার সুযোগ ছিল। জন মানির দেওয়া ট্রিটমেন্ট ছিল বিপর্যস্ত রাইমার দম্পতির খড়কুটো ধরে বাচার চেষ্টা। ব্রুস ছিল নিজ থিওরি প্রমাণে মরিয়া জন মানির কল্পনার সোনার হরিণ।

* * *

সোমবার, ৩ জুলাই, ১৯৬৭। বাল্টিমোরের জনস হপকিন্স হসপিটালে বাইল্যাটারাল অর্কিডেকটমির মাধ্যমে বাইশ মাস বয়েসী ব্রুসের শরীর থেকে অণ্ডকোষ অপসারণ করা হয়। ঠিক হল নিয়মিত চিঠির মাধ্যমে জ্যানেট ডঃ মানিকে ব্রুসের ব্যাপারে আপডেট জানাবে। আর বছরে একবার চেকআপের জন্য বাল্টিমোরে ব্রুসকে নিয়ে যাওয়া হবে। মানি রাইমারদের জানিয়ে দিলেন, এ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্রুস যেন নিজেকে একজন মেয়ে মনে করে বেড়ে ওঠে। ওর জীবনের প্রথম বাইশ মাসের ব্যাপারে দুই যমজকে কিছু না জানানোই ভালো হবে। আর হ্যাঁ, ওর একটা নতুন নামের প্রয়োজন হবে। বাড়ি ফিরে তাই জ্যানেট আর রনাল্ড দ্বিতীয়বারের মতো তাদের সন্তানের নামকরণ করলো। ব্রুস পরিণত হল ব্রেন্ডায়।
ব্রেন্ডার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে ডঃ মানি তার বক্তব্য, গবেষণা ও বইতে চাঞ্চল্যকর এ কেইসের কথা প্রকাশ করা শুরু করলেন। তবে সংগত কারণেই রাইমারদের পরিচয় প্রকাশ করলেন না। প্রায় রাতারাতি ব্রুস/ব্রেন্ডার কেইসের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জন মানি প্রচার করা শুরু করলেন – নারী বা পুরুষ হওয়া মানুষের সত্ত্বাগত কোন বৈশিষ্ট্য না। পরিবেশ, প্রেক্ষাপটের দ্বারা একজন মানুষ নারী বা পুরুষ হতে শেখে। আর এর অকাট্য প্রমাণ হল দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন ছেলে হিসেবে এবং অন্যজন সুস্থ সবল মেয়ে হিসেবে বড় হয়ে উঠছে।

ব্রুস/ব্রেন্ডার কেইস ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সাইকোলজি, সেক্সোলজি, জেন্ডার স্টাডি ইত্যাদি ডিসিপ্লিনের পাঠ্যবইয়ে এ কেইসের কথা যুক্ত করা হয়। এ কেইস ছিল মানবিক যৌনতা, লিঙ্গ ও মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচক। এক মাইলফলক। প্রকৃতি বনাম প্রশিক্ষণের (Nature vs Nurture) যুদ্ধে প্রশিক্ষণের বিজয়ের অবিসম্বাদিত প্রমাণ ছিল ব্রুসের সফলভাবে ব্রেন্ডায় পরিণত হওয়া। এ উপসংহার বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মানির জন্য এটা ছিল শিশু যৌনতা, লিঙ্গ ও যৌনতার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেতার প্রিয় থিওরির প্রমাণ। সমকামী এবং অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত

ব্যক্তিদের জন্য এ কেইস এবং এর উপসংহার গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের কারণে যদি একজন ছেলে একজন মেয়েতে পরিণত হতে পারে, তাহলে একজন পুরুষ বা নারীর সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে কেন অস্বাভাবিক, বিকৃত বা অসুস্থতা মনে করা হবে? খোদ নারী বা পুরুষ পরিচয়ই যদি পূর্ব-নির্ধারিত না হয়, অপরিবর্তনীয় না হয়, বরং অর্জিত (learned/acquired) হয়, তাহলে কীভাবে যৌনতা পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে?

অন্যদিকে ফেমিনিস্টদের জন্য এ কেইস গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছিল নারী ও পুরুষের মধ্য মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ছেলেরা যা পারে, মেয়েরাও তাই পারে। ছেলেরা যতোটুকুপারে ততোটুকুই পারে। তাই কিছু কাজে, যেমন ম্যাথম্যাটিকস বা শিল্পে (art), ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে দক্ষ – এ কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পুরুষ ম্যাথম্যাটিশিয়ানদের সমান সংখ্যক নারী ম্যাথম্যাটিশিয়ান দেখা যায় না, কিংবা নারীদের মধ্যে কোন বেইতোভেন, মোৎযার্ট কিংবা মাইকেলেঞ্জেলোকে পাওয়া যায় না - এটা জাস্ট শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা পুরুষতন্ত্রের প্রভাব।
১৯৭৩ এর জানুয়ারি সংখ্যায় টাইম ম্যাগাযিন মন্তব্য করে – *"চাঞ্চল্যকর এই কেইস নারীবাদীদের বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেয়।"*

ডেইভিড

কিন্তু মিডিয়ার রঙ্গিন আর অ্যাকাডেমিকদের এলিগ্যান্ট তত্ত্বের জগত থেকে দূরে উইনিপেগের ছবিটা ছিল অন্যরকম। একবারে শুরু থেকেই রাইমাররা অনুভব করতে পারছিলেন কোন একটা জায়গায় হিসেবে মিলছে না। কোথাও কোন একটা সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। যদিও ওরা দু'জন এটা স্বীকার করতে চাচ্ছিলো না। একেবারে ছোটবেলা থেকেই 'ব্রেন্ডা'র আচরণে মেয়েলিপনার কোন ছাপ ছিল না। ওর প্রিয় কাজ ছিল দৌড়ানো, ব্রায়ানের গাড়ি নিয়ে খেলা করা আর ছেলেদের সাথে পুরো দমে মারপিট করা। পুতুল খেলা ছিল দু চোখের বিষ। স্কুলে ও ছিল একা। রাগী, একগুঁয়ে। মেয়েদের সাথে খেলতে চাইতো না। ছেলেরা ওকে খেলায় নিতো না। এমনকি বাসাতেও খেলার সময় ও নেতৃত্ব দিতো। ব্রায়ান ওর অনুসরণ করতো। ওর হাটা, চলা, কথা সবকিছুতে ব্রুসকে দেখতে পাওয়া যেতো, ব্রেন্ডাকে না।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, রাগ, কষ্ট। ও বুঝতে পারছিল ও অপরিচিত, অদ্ভুত। ও খাপ খায় না। এসব কিছুর প্রভাব পড়ছিল ওর পড়াশোনায়। প্রথমে গোপন রাখতে চাইলেও স্কুলে ক্রমাগত খারাপ পারফরমেন্সের পর শিক্ষকদের নানা ধরণের প্রশ্নের জবাবে রাইমাররা ওর অতীত সম্পর্কেজানাতে বাধ্য হয়। স্কুল থেকেই ওর জন্য সাইকলোজিস্ট ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু একের পর এক সাইকলোজিস্ট এ সিদ্ধান্তেই পৌছাতে বাধ্য হন, যদিও ব্রুস হওয়ার কোন স্মৃতি ওর নেই তবুও 'ব্রেন্ডা' কোন এক কারণে – তার রূপান্তরকে মেনে নিচ্ছে না। একের পর এক সাইকলোজিস্ট এবং জ্যানেট তার নিয়মিত চিঠিতে মানিকে ব্যাপারগুলো জানান। কিন্তু বরাবরই ডঃ মানি বিষয়টিকে "টমবয়ের স্বাভাবিক দস্যিপনা" বলে উড়িয়ে দেন।

তবে এক পর্যায়ে ডঃ মানিও বাধ্য হন ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিতে। কারণ তার পূর্নাঙ্গ থিওরিকে প্রমাণ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছিলো। মানির থিওরি অনুযায়ী ব্রেন্ডার রূপান্তরকে সম্পূর্ণ করতে কৈশোরের আগেই সার্জারি মাধ্যমে ওর শরীরে যোনি স্থাপন করা আবশ্যক। এটাই হল রূপান্তরের ফাইনাল স্টেপ। কিন্তু ব্রেন্ডাকে কোন ভাবেই সার্জারির জন্য রাজি করানো যাচ্ছিলো না। সার্জারি কথা শুনতেই ও রাজি না। ডঃ মানি বিভিন্ন ভাবে ব্রেন্ডাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। নিজ অফিসের নির্জন রুমে তিনি ব্রেন্ডাকে ছবি দেখান। নারী ও পুরুষের নগ্ন ছবি। যৌনাঙ্গের ছবি। মিলন রত ছবি। প্রসবের ছবি। মানির যুক্তি ছিল, নারীত্ব ও যোনির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্রেন্ডাকে মানব যৌনতা সম্পর্কেধারণা দেওয়া ছিল আবশ্যক। যেহেতু মানি বিশ্বাস করতেন জন্ম থেকেই মানবশিশুর মধ্য যৌনতার অনুভূতি থাকে তাই এতে কোন বিপদের আশঙ্কাও ছিল না। ডঃ মানি জ্যানেট এবং রনাল্ডকে বাসায় বাচ্চাদের সামনে, বিশেষ করে ব্রেন্ডার সামনে সঙ্গম করার পরামর্শ দেন, যাতে করে যৌনতা সম্পর্কেওদের ধারণা আরো পরিষ্কার হয়। ওরা অস্বীকৃতি জানালে, মানি পরামর্শ দেন জ্যানেট যেন

অ্যাটলিস্ট গৃহস্থালির কাজ করার সময় নগ্ন থাকে। যাতে করে নারী পুরুষের পার্থক্য এবং নিজের নারীত্ব সম্পর্কেব্রেন্ডার বিশ্বাস আরো গাঢ় হয়।[1] বিশ্ববিখ্যাত ডঃ-এর এই প্রেসক্রিপশান রাইমাররা মেনে চলার চেষ্টা করে। পুরো ব্যাপারটা ব্রেন্ডাকে আরো বিভ্রান্ত, আরো দিশেহারা করে তোলে। ব্রেন্ডার বয়স ছিল ৭ বছর।

ব্রেন্ডার "ট্রিটমেন্ট" চলতে থাকে। কিন্তু সময়ের সাথে সবার কাছে পরিষ্কার হতে থাকে ও আর দশটা মেয়ের মতো না। বরং ব্রেন্ডার কোন কিছুই মেয়ের মতো না। ব্রেন্ডার বয়স বারো হলে ডঃ মানির পরামর্শে ওকে হরমোন ট্যাবলেট খেতে বাধ্য করা হয়। বন্ধুহীন, নিরাপত্তাহীন নিষ্ঠুর এক পরিবেশে ব্রেন্ডা বড় হতে থাকে। নিজের মেয়েলি পোশাক, নিজের অস্বাভাবিকতা, ভাঙ্গতে থাকা কণ্ঠস্বর, নিজের শারীরিক অসম্পূর্ণতা, সার্জারির জন্য বাবা-মার চাপাচাপি, একের পর একে সাইকলোজিস্টের সাথে সেশন, বাল্টিমোরের নির্জন রুমের অন্ধকার স্মৃতি, নিজের একাকীত্ব, হঠাৎ ডঃ মানির কথা মতো ওর উপর জোর করে সার্জারি করা হবে, এই ভয় – সব কিছু মিলিয়ে ক্রমেই গভীর হতে থাকা রাগ আর হতাশার এক ঘূর্ণিপাকে ব্রেন্ডা নিজেকে আবিষ্কার করে। ওর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত লোকাল সাইকলোজিস্টের পরামর্শে, ডঃ জন মানির অমতে রনাল্ড আর জ্যানেট সিদ্ধান্ত নেয় ব্রেন্ডাকে ওর অতীত সম্পর্কেজানাবার।

* * *

১৯৮০-র মার্চের এক পড়ন্ত দুপুরে সাইকলোজিস্টের সাথে সাপ্তাহিক সেশনের পর রনাল্ড সব কিছু ব্রেন্ডাকে খুলে বলে। গাল বেয়ে পড়া পানি আর হাতের গলতে থাকে কোন আইসক্রিমের ফোটা কোলে জমতে থাকে। ও নিজের ভেতর মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। বোধশক্তি হবার পর থেকে বিভ্রান্তি আর ওর কাছে দুর্বোধ্য, অজানা এক বাস্তবতার যে বোঝা ওর ওপর চেপে ছিল, মনে হল শেষ পর্যন্ত তা তুলে নেয়া হয়েছে। রনের কথা শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই ব্রুস ওর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। ও একজন ছেলে আর ও ছেলে হিসেবেই জীবন কাটাবে। অতীতের সব চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টায় ও নিজের জন্য নতুন নাম বেছে নেয়। ডেইভিড। বাইবেলের সেই ছেলেটার মতো যে বিশাল দানবকে যুদ্ধ হারিয়েছিল। ডেইভিড রাইমার।

ছোটকালে হওয়া দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রাইমাররা কিছু টাকা পেয়েছিল। এ টাকা ডেইভিড সার্জারির জন্য খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে জন মানির প্রস্তাবিত সার্জারি না। বরং তার উল্টো রেসাল্টের জন্য। এই ফ্যালোপ্ল্যাস্টি সার্জারিতে ডেইভিডের ডান কবজি থেকে মাংস, নার্ভআর আর্টারি এবং ওর বাম পাজড় থেকে কার্টিলেজ নিয়ে ওর শরীরে একটি কৃত্রিম লিঙ্গ স্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। বারো ধাপের এ সার্জারি শেষ করতে তিন জন সার্জেনের ১৩ ঘণ্টা সময় লাগে। সার্জারি সফল হয়। সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৯০ এ ডেইভিড রাইমার জেইন ফন্টেইনকে বিয়ে করে।

গল্পটা এখানে শেষ হলে ভালো হতো। ডেইভিড সুখে-শান্তিতে তার বাকি জীবন কাঁটিয়ে দিল। ক্ষতবিক্ষত, ভ্রমণ ক্লান্ত, কিন্তু সন্তুষ্ট একজন মানুষ হিসেবে – এমন উপসংহার হয়তো সবার জন্যই ভালো হত। কিন্তু বাল্টিমোরে জন মানির সাথে নির্জন সেশনগুলোতে এমন কিছু হয়েছিল যার বীজ ও আর ব্রায়ান ভেতরে বয়ে বেড়াচ্ছিল। এমন এক অন্ধকারে উঁকি দিতে ওরা বাধ্য হয়েছিল, আমৃত্যু যা ওদের তারা করে বেড়াবে। শত চেষ্টার পরও যে অন্ধকারের কবল থেকে ওরা মুক্ত হতে পারেনি।

ব্রায়ান

খুব কম বয়সে ব্রায়ান মদ ধরে। সপ্তাহান্তে ফুর্তির জন্য মদ খাওয়া না। দুনিয়ার উপর জেদ নিয়ে, নিজের সাথে নিজে পাল্লা দিয়ে, দিনের পর দিন কখনো পুরোপুরি মাতাল না থাকার মতো করে মদ খাওয়া। ওর মাথার ভেতর, ওর মনে ভেতর কিছু একটা ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। সবসময় অনুতপ্ত, আর ডেইভিডকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রণ আর জ্যানেটের হয়তো ব্যাপারটা খেয়াল করার মতো অবস্থা ছিল না, তবে সমস্যাটা সামনে আসতে শুরু করে যখন ডেইভিডের অতীতের ব্যাপারে সত্য দু ভাইকে জানানোর পর। পুরো ঘটনায় সবার মনোযোগ ছিল ডেইভিডের উপর। সংগত কারণেই। ব্রায়ান ব্যাপারটা কীভাব হ্যান্ডেল করছে সেই দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ তেমন ছিল না। তাই যখন কিছুদিন পর ব্রায়ানের নার্ভাস ব্রেক ডাউনের মতো হল, তখন সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক দুর্ঘটনা আর বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে করতে

অনেকটাই অবশ হয় আসা রাইমার পরিবার তাদের লম্বা দুর্ভাগ্যের লিস্টের আরেকটি দুর্ভাগ্য হিসেবে একে দেখে। কিন্তু সমস্যা বাড়তে থাকে। ব্রায়ানের মানসিক সমস্যাকে রাইমাররা সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হয় যখন ডেইভিডের সার্জারির দু সপ্তাহ আগে ব্রায়ান প্রথমবারের মতো আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কদিন পরই ছিল দু'জনের ষোলতম জন্মদিন। কিছুদিন পর ব্রায়ান পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়। এক পেট্রোল পাম্পে চাকরি নেয়। বাসা থেকে বের হয়ে গার্ল ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে আলাদা থাকা শুরু করে। প্রথমবার বিয়ে করে ১৯ বছর বয়সে। কিন্তু দু সন্তানের জন্মের পরও বিয়েটা টেকে না। কয়েক বছরের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। নেশাতুর কয়েক বছর কাটাবার পর আবার বিয়ে করে ব্রায়ান। কিন্তু আবারো একই পরিণতি।

ভেতরের অস্থিরতা ওর জীবনকেও অস্থির করে তুলছিল। কিছু একটাকে ভুলে থাকতে, চাপা দিতে চাইছিল ও। নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টায় মদ আর ঘুমের ওষুধের নেশার গাড়, অবশ অনুভূতির চাদরে মনকে, চিন্তাকে ঢেকে রাখছিল। ঠিক কী থেকে ব্রায়ান পালাতে চাইছিল রন আর জ্যানেট বুঝতে পারছিল না। ওদের বোঝার উপায়ও ছিল না। পৃথিবীতে কেবল একজনই জানতো জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে কোন স্মৃতি থেকে ব্রায়ান পালিয়ে বেড়াতো, আর অচেতন অবস্থায় কোন স্মৃতি দুঃস্বপ্ন হয়ে ওর সামনে হাজির হতো। কিন্তু ডেইভিড সংকল্প করেছিল ভুলে থাকার।

ডেইভিড আর ব্রায়ানের শৈশব কোন অর্থেই সহজ ছিল না। খুব অল্প বয়স থেকেই ডেইভিডকে তীব্র কষ্ট, হতাশা, প্রতিকূলতা আর ভয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। একই মাত্রায় না হলেও একই কথা ব্রায়ানের ক্ষেত্রেও খাটে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ডেইভিড এবং ব্রায়ানের সবচেয়ে অপছন্দের, সবচেয়ে ভয়ের স্মৃতি ছিল বাল্টিমোরের দিনগুলো। ডঃ মানির অফিসে কাটানো নির্জন সময়গুলোর দু ভাইয়ের মনে কী গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায় ডেইভিডের এক দুর্লভ স্বীকোরোক্তি থেকে। ডেইভিড আর জেইন ডকুমেন্টারি দেখছিল। সিআইএ- এর টর্চার নিয়ে বানানো ডকুমেন্টারিতে দেখানো হচ্ছিল কীভাবে বন্দীদের যৌনাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়। হঠাৎ জেইন আবিষ্কার করলো ডেইভিড চিৎকার করে কাঁদছে। প্রলাপ বকছে। ভিডিওর ঐ দৃশ্য ওকে ভয়ঙ্কর কোন স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। কান্নার দমকে এলোমেলো হয়ে যাওয়া কথাগুলো বুঝতে না পারলেও জেইন একটা নাম চিনতে পারছিল। জন মানি।

জন মানি

রাইমাররা বছরে একবার বাল্টিমোরে যেতো, রেগুলার চেকআপের অংশ হিসেবে। প্রথমে ওরা চারজন ডঃ মানির অফিসে বসতো। রন আর জ্যানেটের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ডঃ মানি ব্রায়ান আর ব্রুসকে আলাদা রুমে নিয়ে যেতেন। প্রাইভেট সেশনের জন্য। একজন নারী হিসেবে স্বাভাবিক "বিকাশের" জন্য ব্রুস/ব্রেন্ডাকে নগ্নতা ও যৌনতার মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়া ডঃ মানির মতে অপরিহার্য ছিল। "স্বাভাবিক বিকাশের" অংশ তিনি ব্রুস আর ব্রায়ানকে পর্ণোগ্রাফি আর স্টিল ইমেজ দেখান। যখন ওদের বয়স ৭, এক সেশনে ডঃ মানি ওদের দু জনকে কাপড় খুলে নগ্ন হবার নির্দেশ দেন। ৭ বছরের নগ্ন ব্রুসকে জন মানি হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝেতে চার হাত-পায়ে ভর দিতে বাধ্য করেন। মানি তারপর নগ্ন ব্রায়ানকে বলেন ব্রুসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে। আবার কোন কোন সেশনে মানি ব্রুসকে বলেন দু পা ছড়িয়ে করে চিত হয়ে শুতে। আর তারপর ব্রায়ানকে বাধ্য করেন ব্রুসের উপড়ে উঠতে। ছোট্ট এ যমজ শিশু দুটিকে জন মানি সেক্সুয়াল রোল-প্লে তে বাধ্য করেন।[2] এ অবস্থায় জন মানি ওদের ছবি তোলেন। তিনি ওদের এমন এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করেন যা সারা জীবনের জন্য ওদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে এই "থেরাপি" সেশন দুই যমজের উপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। জীবনভর শত চেষ্টার পরও ওরা এ ভয়ঙ্কর স্মৃতি মুছে ফেলতে ব্যর্থ হয়। যখন ডেইভিড শেষ পর্যন্ত তার অতীত সম্পর্কেজানতে পারে তখন আর সব কিছু পেছনে ফেলে আসতে পারলেও এই বিকৃত যৌন নির্যাতনকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা ওর আর ব্রায়ানের জন্য সম্ভব ছিল না। ১৩ বছর বয়সে যখন ব্রায়ান বুঝতে পারলো ওর বোন আসলে ওর ভাই, এবং জন মানি ওদেরকে দিয়ে যা করিয়েছিলেন তা অজাচার এবং সমকামের অনুকরণ – তখন পুরো ব্যাপারটা কীভাবে ওর মনের উপর ঠিক কী রকম প্রভাব ফেলেছিল? এ ধরণের স্মৃতি একজন মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে, ভেঙ্গে চুড়ে দিতে বাধ্য।

ব্রায়ান চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ স্মৃতি, এ অন্ধকারের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ও ব্যর্থ হয়। ওর ডিপ্রেশন, মুড সুইংস, মদ আর ঘুমের ওষুধের নেশা তীব্র হতে থাকে। ২০০২ এর বসন্তে ৩৬ বছর বয়সে ব্রায়ান আত্মহত্যা করে। ব্রায়ানের মৃত্যু ডেইভিডের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন কারণে ওর আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ডেইভিড নিজেও ডিপ্রেশনের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে শুরু করে। ব্রায়ানের মৃত্যুর প্রায় দু' বছর পর, মে-র এক দুপুরে জেইন ওকে জানায় কিছু দিনের জন্য ও আলাদা থাকতে চাচ্ছে। যদিও জেইন আশ্বস্ত করে বলে ও ডিভোর্সের কথা ভাবছে না, ডেইভিড সবচেয়ে খারাপ পরিণতিকেই অবধারিত বলে ধরে নেয়। ও নিজেকে ব্যর্থ মনে করছিল। স্বামী হিসেবে, পুরুষ হিসেবে। সেদিন রাতে ডেইভিড ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়। কোন অঘটনের আশংকায় জেইন থানায় রিপোর্ট করে। পরদিন পুলিশ জানায় ডেইভিড সুস্থ আছে, বেঁচে আছে। তবে কোথায় আছে সেটা ও জেইনকে জানাতে চায় না। বিপদ এড়ানো গেছে ভেবে জেইন সেদিনকার মতো অফিসে যায়। ও বেড়িয়ে গেলে ডেইভিড বাসায় আসে। খুঁজে বের করে গ্যারজে নিয়ে ধীর স্থির ভাবে ওর শটগানের ব্যারেল চেঁছে নেয়। তারপর গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যায়।

* * *

২০০৪ সালের ৪ই মে ওর বাসার কাছে এক সুপারস্টোরের পার্কিং লটে ডেইভিডের বিস্ফোরিত খুলির মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওর বয়স ছিল ৩৮ বছর।[3]

* * *

জন মানি মারা যান ২০০৬ সালে, ৮৫ বছর বয়সে, পার্কিন্সন্সে ভুগে। বিশ্বখ্যাত, নন্দিত অ্যাকাডেমিক, মনস্তত্ত্ব ও যৌনতার গবেষণায় নব দিগন্তের সূচনাকারী পথিকৃৎ হিসেবে। মানির অনেক থিওরি মানবিক যৌনতা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রমাণিত সত্য হিসেবে গৃহীত হয়। Gender Role, Gender Identity এবং Gender Fluidity –এর মতো অনেক ধারণা ও পরিভাষা সরাসরি ডঃ মানির কাছ থেকে নেওয়া। ডেইভিড রাইমারের জীবনের প্রথম দিকে ডঃ মানি ব্যাপকভাবে কেইসটিকে তার থিওরির স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রচার করেন। তিনি বলেন ডেইভিডের ঘটনা প্রমাণ করে মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয় পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রকৃতির মাধ্যমে না। মানি ডেইভিডের কেইসকে অমিশ্র সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেন। এ কেইসকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে জনস হপকিন্সে এরকম আরো অনেক সার্জারি ও "ট্রিটমেন্ট" করা হয়। পুরো ব্যাপারটা যে রাইমার পরিবারের জন্য এক মহা বিপর্যয় ছিল, মানির লেখা থেকে বোঝার উপায় ছিল না। মানি এক সুখী পরিবারের ছবি এঁকেছিলেন যেখানে হাসিখুশি বাবা-মা পরম যত্নে তাদের দুই সুস্থ-স্বাভাবিক সন্তানকে বড় করছে। আর লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি মাধ্যমে যাওয়া শিশুটি সবদিক দিয়ে একজন স্বাভাবিক মেয়ে হিসেবে বেড়ে উঠছে।[4] অথচ বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। যখন ১৩ বছর বয়সে ডেইভিড একজন পুরুষ হিসেবে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, ডঃ মানিকে ব্যাপারটা জানাও হয়। কিন্তু মানি তার প্রকাশিত বই, জার্নাল, আর্টিকেল, বক্তব্য – সব জায়গাতেই এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি উল্লেখ করতে ভুলে যান। তবে ডেইভিডের কেইস সম্পর্কেকথা বলা কমিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে যখন ডেইভিডের কেইসের আসল অবস্থার কথা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়, মানি তার এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার জন্য মিডিয়া হট্টগোলকে দায়ী করেন। কখনো রক্ষণশীল মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা বলেন আবার কখনো রন আর জ্যানেটের অভিভাবক হিসেবে যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও এর আগে মানির নিজের মেডিকাল নোটসে দু'জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ডেইভিড রাইমারের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে জন মানির ভেতরে বিন্দুমাত্র অনুতাপ দেখা যায় নি।

তবে মানি স্বীকার না করলেও রাইমার যমজের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবন আর আত্মহত্যার পেছনে তার এক্সপেরিমেন্ট এবং বিশেষ করে তার থেরাপি সেশনগুলোর ভূমিকা কোন সুস্থ, সুবিবেচক মানুষ অস্বীকার করার কথা না। ক্রমাগত তীব্র যৌনতার উপস্থাপন, যৌন সঙ্গম অনুকরণে বাধ্য করা, এমন অবস্থায় ছবি তোলা, ক্রমাগত তার যৌনাঙ্গ এবং যৌন পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সর্বোপরি একজন ছেলেকে জোর করে একজন মেয়েতে পরিণত করার চেষ্টা – এ বিষয়গুলো খুব সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর এধরনের ঘটনার তীব্র ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আর ডেইভিড আর ব্রায়ানের সাথে এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল শৈশব থেকে।

* * *

একজন বিখ্যাত, সম্মানিত সাইকলোজিস্ট কেন শিশুদের এধরনের আচরণে বাধ্য করবেন, পাঠকের মনে এমন প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কোন মেডিকাল ডিগ্রি না থাকা একজন সাইকলোজিস্ট কীভাবে একের পর এক রোগীকে এতো বড় মাপের একটা সার্জারি করার পরামর্শ দিয়ে যেতে পারেন, সেটা নিয়েও প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু যৌনতা, বিশেষ করে শিশু যৌনতা সম্পর্কেডঃ মানির দর্শন সম্পর্কেজানার পর ব্যাপারটা অসুস্থ-বিকৃত মনে হলেও, আর অস্বাভাবিক মনে হয় না। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে তার বিভিন্ন বই, জার্নাল পেপার ও বক্তব্যে বার বার জন মানি ব্যাখ্যা করেছেন কেন শৈশবেই শিশুদের যৌনতার শিক্ষা দেয়া উচিৎ। টাইম ম্যাগাযিনের এপ্রিল, ১৯৮০ সংখ্যা মানি বলেন –

শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতা - যেমন তুলমামূলক ভাবে বয়স্ক কোন ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন – শিশুর জন্য নেতিবাচকই হবে এমন কোন কথা নেই।[5]

যদি কোন কোন পাঠক মানির উপরের কথার মধ্যে পেডোফিলিয়া বা শিশুকামিতার গন্ধ পেয়ে থাকেন তাহলে ডাচ পেডোফিলিয়া ম্যাগাযিন "পাইডিকা"-তে ১৯৯১ এর সাক্ষাতকারে বলা জন মানির নিচের কথাগুলো হয়তো অস্পষ্ট ছবিকে আরেকটু পরিষ্কার করবে –

"ধরুন আমি যদি দেখি ১০ বা ১১ বছর বয়সের একটি ছেলে বিশের বা ত্রিশের কোঠার কোন পুরুষের প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে, যদি তাদের সম্পর্কপারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়, তাদের বন্ধন যদি পারস্পরিক হয়, তাহলে আমার মতে এধরনের সম্পর্ককে কোন ভাবেই বিকারগ্রসথ বা অসুস্থ (pathological) বলা যায় না।"[6]

পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একই সাক্ষাৎকারে জন মানি বলেন –

"স্নেহময় শিশুকাম (affectional pedophilia) হল সহজ ভাষায় শিশুদের প্রতি স্নেহময় আকর্ষণ। অভিভাবক সুলভ ভালোবাসা ও বন্ধনের যৌন ভালোবাসা ও বন্ধনে পরিণত হওয়া। এই স্নেহময় সম্পর্ক, পুরুষ শিশুকামের ক্ষেত্রে পিতৃ সুলভ ভালোবাসার মতো। এতে কেবল পিতৃ সুলভ ভালোবাসার সাথে যৌন বা প্রেমময় বন্ধন যুক্ত হয়েছে। স্নেহময় ভালোবাসার সাথে প্রেম ও কামনা যুক্ত হয়েছে।"[7]

পাইডিকার এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য ডাচ প্রফেসর থিও স্যানফোর্টের -Boys & Their Contacts with Men: A Study of Sexually Expressed Friendships – নামের বইয়ের ভূমিকাও লেখেন জন মানি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল এগারো থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাথে পায়ুকামের আনন্দঘন বর্ণনা। থিও স্যানফোর্টের দাবি বইয়ের প্রতিটি বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জন মানি এ বইয়ের ভূমিকায় লেখেন –

"২০০০ সাল ও তার পরে জন্ম নেওয়া প্রজন্মের জন্য আমরা হব ইতিহাস। শিশু যৌনতা ও এর মূলনীতির ব্যাপারে আমাদের আত্মকেন্দ্রিক, নৈতিকতা নির্ভর অজ্ঞতা নিঃসন্দেহে পরবর্তী প্রজন্মকে বিস্মিত করবে...শিশুকামিতা ততোটুকই ঐচ্ছিক, বাঁহাতি হওয়া বা অন্ধ হওয়া যতোটুক ঐচ্ছিক...এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ইতিবাচক বই।"[8]

Development of paraphilia in childhood and adolescence – নামক প্রবন্ধে জন মানি বলেন –

"শিশুকাম স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া না, আর ইচ্ছে করলেই একজন শিশুকামি একে ছেড়ে আসতে পারে না। শিশুকামি যৌনতার ব্যাপারে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা অনুরক্তি বা, বরং এটি যৌন-মনস্তাত্ত্বিক গঠন। একজন মানুষের শিশুকামি হওয়া বাঁহাতি বা কালার ব্লাইন্ড হবার মতো (অর্থাৎ বিষয়টি তার সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছার ঊর্ধ্বে)।"[9]

শিশুকাম ছাড়া অন্যান্য যৌন বিকৃতির ব্যাপারেও মানির অবস্থান কম বিস্ময়কর না। জন মানি তার পাবলিক লেকচার এবং ক্লাসগুলোতে ইচ্ছাকৃত এমন সব বিষয় উপস্থাপন করতেন যা যে কোন বিবেচনায় চরম মাত্রার অশ্লীল হিসেবে গণ্য হবে।

উইনিপেগের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার অতিথি হয়ে লেকচার দিতে এসে প্রথমদিন উপস্থিত দর্শক, সাংবাদিক, প্রফেসর ও ফার্স্ট ইয়ার মেডিকাল ছাত্রদের সামনে মানি একটি ভিডিও উপস্থাপন করেন যেটাতে পশু কাম, মানব মূত্র পান, মানব বর্জ্য খাওয়া, অ্যাম্পুটেইশান ফেটিশ সহ বিভিন্ন যৌন বিকৃতির ছবি ও ভিডিও উপস্থাপন করা হয়। পরের দিন তিনি গ্রুপ সেক্সের একটি ভিডিও দেখান। ভিডিও শেষে ঘোষণা করেন, বিয়ে হল নিছক একটি অর্থনৈতিক বোঝাপড়া যেখানে হৃদয় মানিব্যাগের অনুসরণ করে। আর অযাচারকে অপরাধ বিবেচনা করা অনুচিত।[10]

আধুনিক সেক্সোলজির অন্যান্য আরো অনেক শব্দের মতো প্যারাফিলিয়া (Paraphilia) শব্দটিও উদ্ভাবন করেন ব্যক্তিগত জীবনে উভকামি জন মানি। এর আগে বিকৃত যৌনাচারের ক্ষেত্রে "Perversion" বা "বিকৃতি" শব্দটি ব্যবহৃত হত। কিন্তু জন মানি প্যারাফিলিয়া শব্দের প্রচলন ঘটান। "বিকৃতি"- এর সাথে নেতিবাচকতা যুক্ত থাকে। জন মানি শিশুকাম, অজাচার ও উভকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনাচারকে নেতিবাচকতার কবল থেকে মুক্ত করে কেবল "অপ্রচলিত" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। অন্যদিকে স্বাভাবিক যৌনাচারকে মানি সংজ্ঞায়িত করেন Normophilia হিসেবে। মানির ভাষায় Normophilia হল এমন সব ধরণের যৌনাচার যা কোন সমাজের বিদ্যমান মানদণ্ড অনুযায়ী – সেটা আইন, ধর্ম বা অন্য কোন কিছু হতে পারে - স্বাভাবিক (Norm) হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ যৌনতা কেবল প্রচলিত আর অপ্রচলিত। প্রথাগত আর প্রথাবিরোধী। প্রাকৃতিক ভাবে যৌনতার মধ্যে কোন ভালো বা মন্দ নেই। কোন সুস্থ যৌনতা আর কোন বিকৃত যৌনতা নেই। যৌনতার ব্যাপারে কেবল সমাজের ধারণা আছে। এভাবে ভাষার অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুত জন মানি সব ধরণের যৌনাচারকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করেন। কারণ যদি কোন সমাজে শিশুকাম গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সেই সমাজের সেটাই প্রথা। এখানে নৈতিক বিচারে কোন জায়গা আর থাকে না। পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। জন মানির জগতে কোন যৌনাচারই বিকৃত না। সব কিছুই স্বাভাবিক। তাই ৬/৭ বছরে বাচ্চাদের সমকামী যৌনতার অনুকরণে বাধ্য করা, যমজ দুই ভাইকে অজাচারের অনুকরণে বাধ্য করার সাথে "ঠিক বা ভুলের" কোন সম্পর্কনেই।

* * *

ডেইভিড রাইমারের গল্পকে নিছক একজন ম্যাড সায়েন্টিস্টের পাগলাটে এক্সপেরিমেন্ট কিংবা একজন বিকৃতকামীর বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু বাস্তবতা হল তার নিজের দর্শনের জায়গা থেকে চিন্তার জায়গা থেকে ডঃ জন মানি নির্দোষ। মানির অপরাধ এবং রাইমারদের ট্র্যাজিক পরিণতি একটি নির্দিষ্ট দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল। যদি এর থেকে আলাদা করে পুরো ব্যাপারটিকে একজন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিকৃতির ফলাফল হিসেবে চিত্রিত করা হয় তাহলে মূল সমস্যা ঢাকা পড়ে যায়। বিকৃতকামী, বিকৃত চিন্তার জন মানি নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধী। কিন্তু তার অপরাধ হল উপসর্গ। মূল রোগ হল মানব যৌনতা ও যৌন- মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ঐ দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি যার উপর ভর করে জন মানি তার কাজগুলোকে জায়েজ করছিল। আর এ দর্শনের মূলনীতিগুলো হল –

১) প্রতিটি মানুষ সর্বকামী (pansexual/omnisexual) হিসেবে জীবন শুরু করে। তারপর সে কোন এক বা একাধিক ধরনের যৌনাচারকে বেছে নেয়। এটি জন্মের সময় নির্ধারিত বা প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত না। প্রাকৃতিক ভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনতা সীমাবদ্ধ, এ কেবলই একটি সামাজিক প্রচলন।

২) মূলত সব ধরণের যৌনতাই স্বাভাবিক। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন যৌনতার ব্যাপারে আমাদের ধারণা বদলায়। আমাদের সামাজিক চিন্তার কারণে আমরা কিছু যৌনাচারকে স্বাভাবিক আর কিছু যৌনাচারকে অস্বাভাবিক মনে করি।

৩) জন্মের পর থেকেই একজন শিশুর মধ্যে যৌনতার ধারণা ও বোধ বিদ্যমান থাকে। একারণেই শিশুকাম বা অজাচার অস্বাভাবিক কিছু না। কালার ব্লাইন্ড বা বাঁহাতি হবার মতো। সমাজের বিদ্যমান নৈতিকতার কাঠামো কারণে আমরা এ কাজগুলোকে অপরাধ বা বিকৃতি মনে করি।

* * *

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হল এই চিন্তাগুলো জন মানির একার বিচ্ছিন্ন চিন্তা না। বরং পশ্চিমের আধুনিক যৌন-চিন্তা এ মূলনীতিগুলোকে সর্বজনীনভাবে স্বীকার করে। এবং গত চার দশক বা আরো বেশি সময় ধরে এর অসংখ্যবার এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মৃত্যুর পরও জন মানির চিন্তা তার প্রভাব জানান দিচ্ছে। গত বেশ ক'বছর ধরে পশ্চিমে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস" নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে এ আন্দোলনকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে। "৫২ বছর বয়েসী ৭ সন্তানের ব্যাপারে এখন ৬ বছরের ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে হিসেবে পরিচিত হতে চান", "ব্রিটেনের প্রথম জেন্ডার ফ্লুয়িড পরিবার: বাবা নিজেকে নারীতে পরিণত করছেন, মা নিজেকে পুরুষ মনে করেন, আর ছেলে বড় হচ্ছে জেন্ডার নিউট্রাল হিসাবে" – এধরনের খবর আশঙ্কাজনক বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ৫০ জন শিশুকে Gender Dysphoria ও Gender Change সঙ্ক্রান্ত ক্লিনিকে পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে ৪ বছর বয়েসী শিশুও আছে। ব্যাপারটা কী? পশ্চিমা বিশ্বে সবাই কি রাতারাতি হিজড়া হয়ে যাচ্ছে?

সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জনে ১ জন True Hermaphrodite বা intersex ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ০.০৫% । এছাড়া বাকি ৯৯/৯৫% মানুষ হয় নারী অথবা পুরুষ। অর্থাৎ মানুষের পরিচয় বাইনারি। অথচ এখন যে কোন মানুষ বা শিশু যদি বলে সে একজন নারী হিসেবে, বা পুরুষ হিসেবে, বা অন্য কোন "কিছু" হিসেবে পরিচিত হতে চায়, তবে তাই ধরে নিতে হবে। সে শারীরিকভাবে, জন্মসূত্রে যাই হোক না কেন! নিউ ইয়র্কেআইনি ভাবে ৩১ টি লৈঙ্গিক পরিচয়কে (Gender Identity) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফেইসবুকে কোন জায়গায় ৬০টি, কোন জায়গায় ৭১ টি জেন্ডার আইডেন্টিটির লিস্ট থেকে "নিজের পরিচয়" বেছে দেওয়া অপশান দেওয়া আছে। ল'রিয়েল, ফোর্ড, নাইকি, টার্গেটসহ বিভিন্ন মেগা ব্র্যান্ড তাদের বিজ্ঞাপনে খোলাখুলি ট্রান্সজেন্ডার মডেলদের ব্যবহার করছে। বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস জেন্ডার নিউট্রাল/জেন্ডার ফ্লুয়িড পোশাক বের করা শুরু করেছে। ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট স্টোর জন লুইস ঘোষণা করেছে তারা বাচ্চাদের পোশাক আর "ছেলে" বা "মেয়ে" ট্যাগ দিয়ে আলাদা করবে না। এখন থেকে তারা বাচ্চাদের শুধু "Unisexz"/"Gender Neutral" পোশাক বিক্রি করবে।

মার্চে টাইম ম্যাগাযিন মানুষের মৌলিক পরিচয় ও যৌনতার পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার এ যুগ নিয়ে কাভার স্টোরি করেছে। Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality – শিরোনামের এ লেখায় সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD এর একটি জরিপের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে অ্যামেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ এখন আর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক যৌনাচারে আকৃষ্ট (Heterosexual) অথবা সম্পূর্ণ ভাবে সমকামিতায় আকৃষ্ট মনে করে না। বরং "মাঝামাঝি কিছু একটাকে" বেছে নেয়। একইভাবে অ্যামেরিকান তরুনদের এক-তৃতীয়াংশ "পুরুষ" বা "নারী" হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় না।[11] অ্যামেরিকাসহ পশ্চিমের অনেক দেশে "ট্রান্সজেন্ডার টয়লেট অধিকার" নিয়ে আন্দোলন চলছে। যার মূল সারমর্ম হল একজন পুরুষ যদি নারী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাহলে নারীদের জন্য নির্ধারিত টয়লেট ব্যবহার করতে পারা তার আইনগত অধিকার। এমনকি কিছু কিছু জায়গায় যদি একজন পুরুষ যদি নিজেকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে চায় আর আপনি যদি তার ক্ষেত্রে he/him/his - ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করেন তবে সেটাকে বেআইনি ঘোষণা করার চিন্তাভাবনা চলছে। কারণ এটা ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করা এবং বৈষম্য। এমনকি কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ডেইলি স্টার তাদের সাপ্তাহিক সাপ্লিমেন্ট "Lifestyle" এ Gender fluidity/ Gender Neutrality – কে সমর্থন করে কাভার স্টোরি করেছে।[12]

ঠিক দু'দশক আগে যেভাবে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরন ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছিল, বর্তমানে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস"-এর নামে ঠিক একই কাজ করা হচ্ছে। "যৌনতা, ব্যক্তি পরিচয় এসবই আপেক্ষিক। ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্তের বিষয়। একজন মানুষ ভেতরে কেমন তাই মুখ্য। সামাজিক প্রথা আর পশ্চাৎপদতার কারণে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি উচিৎ না। যখন কারো ক্ষতি হচ্ছে না তখন বিরোধিতা কেন?" – ইত্যাদি বিভিন্ন কথার মাধ্যমে এই বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক, নির্দোষ কিছু হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে। আর এসব কিছুর মূলে আছে ডঃ জন মানির থিসিস ও ধারণা। তার কিছু অনুসিদ্ধান্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সার্বিক ভাবে তার এসব ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে। তার তৈরি করা (কু)যুক্তি, ভাষা ও অপ-বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে দিয়েই এ বিকৃতিকে মিডিয়া, সাইকলোজিস্ট এবং সেক্সোলজিস্টরা জায়েজ

করার চেষ্টা করছে। এর স্বপক্ষের বয়ান তৈরি করছে। যৌনতার ব্যাপারে পশ্চিমের বর্তমানের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা অনেকাংশেই জন মানির অবয়বে গড়া। ডেইভিড রাইমারের গল্প আর জন মানির অপরাধকে বুঝতে হলে ও বাস্তবতার আলোকেই বুঝতে হবে।

তবে জন মানির ধারণাগুলো তার নিজের ছিল না। সে এগুলোকে সুবিন্যস্ত কাঠামো দিয়েছিল সত্য, কিন্তু তা গড়ে উঠেছিল আরেকজনের স্থাপিত ভিত্তির উপর। একারণেই নিউইয়র্কটাইমস বুক রিভিউ জন মানির "Man & Woman, Boy & Girl"-বইয়ের রিভিউতে বলেছিল, এ বইটি হল সেক্সোলজি সম্পর্কেশতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লিস্টে দ্বিতীয়। লিস্টের প্রথম বই কোনটা? পশ্চিমা যৌন চিন্তা সম্পর্কেলিখিত শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক কে? যৌনতা সম্পর্কেজন মানিসহ অগণিত গবেষক ও সাইকলোজিস্টের এবং সার্বিকভাবে পশ্চিমের চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর কে স্থাপন করেছিল? যে তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জন মানি তার বিকৃত উপসংহারে পৌঁছেছিল, কে ছিল সেগুলোর প্রবক্তা?

এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে আমাদের জানতে হবে ডঃ কিনসির ব্যাপারে।

* * *

* * *

[1] In Sexual Signatures, Money emphasized the importance of such parental genital displays for correct heterosexual child development, and even went so far as to recommend that parents engage in sexual intercourse in front of their children. "With a little calm guidance," he wrote, "the experience can be integrated into the child's sex education and serve to reinforce his or her own gender identity/role

[2] Money made Bruce assume the passive position and then ordered Brian to go behind him and mimic a thrusting motion. He repeated the same thing when he instructed Bruce to lay with legs spread and then ordered Brian to mount him. He forced them into sexual role play. Can't find the words to describe the ordeal in Bengali.

[3] Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical implications. Diamond, M. & Sigmundson, H. K. (1997)

John Colapinto wrote ''As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl

http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/dr_money_prog_summary.shtml

[4] http://www.nytimes.com/1975/05/04/archives/nature-and-nurture-and-gender-sexual-signatures.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FBook+Reviews

[5] "A childhood sexual experience, such as being the partner of a relative or of an older person, need not necessarily affect the child adversely." [ATTACKING THE LAST TABOO (Time Magazine, April 14, 1980.)]

[6] If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual ... then I

would not call it pathological in any way. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.]

[7] Paedophilia is...affectional paedophilia in layman's terms...the straight forward affectional attraction to children...a paedophilic attraction to children...an overflow of parental pairbonding into erotic pair bonding... The affectional relationship, in male paedophilia at least, is a fatherly relationship...with erotic or lover-lover pairbonding...a combination of affectionate love as well as the lust factor...[until] puberty. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.]

[8] . "For those born and educated after the year 2000we will be their history, and they will be mystified by our self-important, moralistic ignorance of the principles of sexual and erotic development in childhood... Pedophilia and ephebophilia are no more a matter of voluntary choice than are left-handedness or color blindness...It is a very important book, and a very positive one." [Introduction - Boys & Their Contacts with Men] https://www.scribd.com/document/65967317/Boys-on-Their-Contacts-With-Men

[9] Pedophilia is not voluntarily chosen, nor can it be shed by voluntary decision. It is not a preference but a sexuerotic orientation or status. It maybe viewed as analogous to left-handedness or color blindness. [John Money -Development of paraphilia in childhood and adolescence]

[10] As Nature Made Him – John Colapinto

[11] http://time.com/4703309/infinite-identities-gender-sexuality-young-people/
http://time.com/4703058/time-cover-story-beyond-he-or-she/

[12] "Androgyny in a fair world" [Lifestyle, The Daily Star, 8th August, 2017]